

০১. শস্যহীন জনবহুল এ-অঞ্চল

শস্যহীন জনবহুল এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশটাকে পর্যন্ত যেন সদা সঙ্গুস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি আর স্থান বিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে— প্রদেশেরও! হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখখোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয়না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির শামিল। তাই তারা ছোট্টে, ছোট্টে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন কিমধরা রেলগাড়ি সর্পির্ল গতিতে এসে পৌঁছয় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাঁকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালঙ্কড়। রাতের অন্ধকারে লঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে। তাছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্ততা আগুনের হস্তার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা-জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ-বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ-লাইনে যারা নোতুন তারা চেয়ে-চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোট্টে। ছোট্টে আর চিৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। ইতিমধ্যে আত্মীয়স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারো-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা—যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না—কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়—এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তারিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্তু থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকরা। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালঙ্কড়ের ঝঙ্কারে উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে-কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ উঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেছে সে-দেশে এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরান মাঠ, সরভাঙ্গা পাড় আর বন্যাভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মজ্জবে আত্ননাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চৈঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন—একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে। জীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক স্রুগলা কেহাের সময় মধু ছডালেও ংদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় স্কীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিৰুঁকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে ক-টা ফিকে দাডি অসংযত দৌৰ্বল্যে বুলে থাকে তাতে মাহাস্ব ফোটাতে চায়, কিন্তু স্কুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা যোচে না। কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতার খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোন এক বিগত যুগে চডায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে ংত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান শ্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে ংমন লোক আবার নেই। অতংব কেতারগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোনো ংক অতীতকালের ংরণ্যে ংর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতা'লার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় ংন্য ংক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু স্কুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-ংদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে-চেয়ে আরো স্কয়ে আসে। খোদার ংলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণো পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে ংজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ংাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে-থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ংলকানো বোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

ংরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির ংটকিনি, ছাপাখানার মেশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ংমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলির মসজিদ—ংমন কি গ্রামে-গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত ংগে থেকে দখল হয়ে ংছে। শেষে কেউ-কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে-মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর-দূর গ্রামে—যে-গ্রামে পৌঁছতে হলে, কত চড়া-পড়া শুঙ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম ংধলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল—সেখানেও।

ংক সরকারী কর্মচারী সেখানে হয়তো ংকদিন পায়ে বুট ংটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু ংসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলসপরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে ং-দুর্গম ংধলে মিহি কণ্ঠের ংজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের ংশাও কিছু দমে যায়।

পরের মৌলভীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ংস্বীয়স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

-ংপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

-ংপনার নাম?

নাম শুনে মৌলভীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে।

শিকারিও পাণ্টা প্রসন্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলভীর মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতা'লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত, কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। ঝুচিং কখনো হাতিও দাবড়ে-কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-পাঁচবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে—মৌলবীর গলা। বুনো ভারি হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়তো চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটের জন্মে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুদের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা, তবে নোতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবীর চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভারতেও পারে না হয়তো।

০২. একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠপ্ৰান্তর আর বিস্তৃত ধান ক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রঙ দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কেঁচ-জুতি। নিষ্পন্দ ধান-ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দত। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয়। আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেলো। অতি সম্ভ্রপণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুই-এ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একজন-চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাকে ফাকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি একেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের এক প্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে-চোখে তার তেমনি শিকারীর সূচাগ্র একাগ্ৰতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাই-এর ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নীচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে উঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বায়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শীষ নড়ছে—নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বায়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙুলি অদ্ভুত ফিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটু শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শীষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিল, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান হয়ে ওঠা তাহেরের কালে দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সে-কালে দেহটির উদ্ধাংশ কেঁপে উঠল, তীব্রের মতো বেরিয়ে গেলো একটা কোঁচা। সা-ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হাঁ করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সম্ভ্রপণে।

এক সময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তাঁর আঙুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিম্নীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শীষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়-সেদিকে দৃষ্টি নেই।

এক সময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটিল। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপিও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা-নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন তাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগ লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জল। চোখ বুজে আছে। কোটরগত নিম্নীলিত সে চোখে একটুও কম্পন নেই।

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটি নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকের পক্ষপাতী। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশী পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বখ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্ৰদ।। চমকপ্ৰদ এই জন্যে যে, তার আগমন মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের নিবুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চীৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলী ছিল। জোয়ান মদ কালু মতি, তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

-আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ। মোদছেহর পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-

গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একাধারে টালখাওয়া ভাঙা এক পুরাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবরণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলোমানের বাপিও ছিল। হাঁপানির রোগী। সে দম থিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

-আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ।-মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাডরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই আমন বিদেশ বিভূ-এ সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাক্ষা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের খাতির-যশ ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার-কয়েক শুনেছে সে-কথা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

- উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...

বলতে বলতে মজিদের কোটরগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়িঘর করে গরু ছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে। কিন্তু মুসল্লীদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহবর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বুঝেছিল যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু'বেল খেয়ে বঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অন্তর! হঠাপানি-রোগগ্ৰস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে। ইট-সুরকি নিয়ে সেই পুরাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের কবরের মতো নোতুন দেহ ধারণ করল। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মতো সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, মোমবাতি জ্বলতে লাগল। রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতসেঁতে ছিল, এখন রোদ পড়ে খটখাটে হয়ে উঠল। হাওয়ারও ভাপসা গন্ধ খড়ের মতো শুষ্ক হয়ে উঠল।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকেরা আসতে লাগল। তাদের মৰ্মমন্ডল কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা-ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাক্ষ টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগল।

কৰমে কৰমে মজিদের ঘৰবাড়ি উঠল। বাহির ঘৰ, অন্দর ঘৰ, গোয়াল ঘৰ, আওলাঘৰ। জমি হলো, গৃহস্থালী হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তাঁর জীবনের যে নোতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চলল। হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোরঙ্গ দিনে মাগর-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারেব পানে চেয়ে কাচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বোবকরা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদাব বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্যে অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ কবে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-বালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিল। দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জুলে উঠেছিল।

শেষে সেই প্রশস্ত ব্যাপ্ত-যৌবন মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল। নাম রহীমা। সত্যি সে লম্বা-চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেলো, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অন্যায়সে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ-যে-দেহ দূর থেকে আলি-বালি দেখে মজিদের বুকে আগুন ধরেছিল-তা বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,
—অমন করি হাঁটে নাই।

খমকে গিয়ে রহীমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,—অমন করি হাঁটে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্ব করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা—থেকে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুণাহ।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহীমা। মুরুব্বীরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়ারা বলেছে। মজিদের কথায় বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে, রহীমার চোখে ভয়।

মধুরভাবে হেসে আবার বলে,—অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশী হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াৎ শুরু করে। গলা ভালো তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুবে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্তাহানার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহীমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতাআলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, স্বামী মসজিদকে ভয় পায়।

পুকুরে গোসল করে সিক্ত বসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহীমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির তাল পায় না, সে-দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে। কিন্তু রহীমার চেতনা নেই।

গলা কেশে মজিদ বলে,—খোলা জায়গায় আমন বে-শরমের মতো দাঁড়াইও না বিবি।

সচকিত হয়ে রহীমা হাত নামায়, বুকে ভালো করে আঁচল দেয়, পেছনে সাপটে থাকা কাপড় আলগা করে দিয়ে এধার-ওধারা যেন বেগান-বোগায়ের লোকের সন্ধানে তাকায়। কিন্তু ঐ তো কেবল মজিদ বসে আছে। দরজার পাশে, হাতে হুঁকা। গলা-সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহীমার সাবা দেহে। দ্রুত পায়ে সে আড়ালে চলে যায়।

মজিদের সামনে এমনভাবে আর দাঁড়ায় না কখনো। গ্রামের লোকেরা যেন রহীমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ-চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্ৰাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয় হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝগড়া উচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে-জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়তো দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলেকা বড় দলগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অথহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্ৰাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবল ঝঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।— ফাটলধরা জৈষ্ঠের জমি-সব জমি একান্ত আপন; কোনোটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষ বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়তো কাঠফাটা বোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি—তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কঁপায়, বোদ-পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ স্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে।—তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সন্ধ্যা, সন্ধ্যা সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকে পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায়। তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন, সে-জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরী করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হ'ল। দেয়। তারপর ছড়ায় চার-ছাড়াবার সময় না তাকায় দিগন্তের পানে, না। স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়তো চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। বোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ

বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জুলে।পুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কেঁদে কেঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্ৰতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমৰ্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খ খ করে। রাত নেই দিন নেই, কেঁদে করে পানি তোলে—মণ-কে-মণ।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সাথে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়তো না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদিনের রক্তাস্রুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরাতি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়তো তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়তো করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খিলাল করে আর সে কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দী হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহবর গুতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহীমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গোটাগোড়া ও প্রশস্ত। রহীমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শীষে এদের আকর্ষণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের সামিল খেয়াল করে না? শ্যেত দৃষ্টিতে অবশ্য চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ-কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালাসালু কাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞাকরে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে সালু কাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বৃত-পূজারী। তারা গুণাগার।

জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে।

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গায়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নাছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালু কাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়বার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা এ-কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুক গান গেয়ে গজব কটানো যায় না, বোঝে। মজিদও আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,-কলমা জানো মিঞা?

ঘাড় গুজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিঞা। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে উঠে মজিদ বলে,-হাসিও না মিঞা।

খতামত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে।

চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,—আমি গরীব মুরুফু মানুষ।

খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জুলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে—গাধার মতো পিঠে ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,—কলমা জানস না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মন্তব্য দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলেমেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি—যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান—সেখানে একদা এক মন্তবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

—ব্যাপারীর মন্তবে তুমি কলম শিখবা।

ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

-গরীব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিটা। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়তো মানুষের সমবেদন আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদন থাকবে। ও কী করে আমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে-কথা। তো। কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

—হইছে হইছে, ভাগ।

একদিন ধাড়িধাড়ি ছেলে কয়েকটি পাকড়াও করে মজিদ।

-কীরে ব্যাটা, খৎনা হইছে?

একটি ছেলে আরেকটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,

-আর অয় নাই।

সে রেগে বলে—অরও অয় নাই।

শুনে আগুন হয়ে যায় মজিদ; বলে, পরশু দিন জুম্মাবার, সেদিন যদি দুজনেরই একসাথে খৎনা না হয়, তবে মুশকিল হবে।

একবার একটি ছেলে বলে,—হেই কবে আমার খৎনা হইছে!

তার বাপও মাথা নেড়ে সায় দেয়,—ছোট থাকতেই খৎনা দিছি। মিছা কথা না হজুর।

কিন্তু মজিদ বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছে, ছেলেটির খৎনা হয়নি। গর্জন করে উঠে বলে,

—তোল লুঙ্গি?

বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে ধ্যা করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিল, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই-পালাই করছিল, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মতো চোখ মেলে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,

—আজই নামাজের পর আমিই তোমার খৎনা দিই। দাড়িগোঁফ ওঠা মদেঁর মতো ছেলে ঠিঁকঠিঁক করে কাঁপতে থাকে। বাপের মুখে রা নেই। শুকিয়ে সে-মুখ আমসি হয়ে গেছে।

সারাটি দুপুর কোরবানীর ছাগলের মতো খুঁটিবন্দী হয়ে থাকে। ছেলেটি। আছরের নামাজের পর মজিদ ছুরি-তেনা নিয়ে আসতেই সে তারস্বরে আত্ননাদ করে উঠে কান্না জুড়ে দেয়। দেখে বাপের আর সয় না, সেও হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। বাইরে লোক জমে গিয়েছিল। খালেক ব্যাপারীও এসেছিল ব্যাপার দেখতে। তারা ধমকাতে থাকে বাপকে।

দাঁত কড়াকড়ি করে মজিদের। মাঠে শয়তানের মতো গান যখন ধরে তখন খোদার কথা আর মনে হয় না? বুড়ো ধামড়া ছেলে, খৎনা হয়নি ভারতেও কেমন লাগে। তওবা, তওবা! ব্যাপারীকে শুনিয়ে মজিদ বলে,

—আপনাগো দেশটা বড় জাহেলের দেশ।

ছেলের কান্না থামে না। মজিদ যখন বাঁশের কঞ্চি ছিলছে তখন সে আরেকবার তারস্বরে আত্ননাদ করে উঠে বলে,

—আমার বাপেরও খৎনা অয় নাই—তানারে আগে দেন।

মজিদ বিস্ময়ে হতভম্ব। খালেক ব্যাপারীর পানে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক হয়ে থাকে, মুখে ভাষা জোগায় না। লজ্জায় ব্যাপারীর কান পর্যন্ত লাল।

আধা ঘণ্টার মধ্যে দু-দুটো খৎনা হয়ে গেলে। ব্যাপারটা ঠিক হাটবাজারের মধ্যে যেন হলো। কারণ বাপ-বেটাকে ধরবার জন্যে লোকের প্রয়োজন ছিল বলে, এবং এসব দৃশ্য না দেখে থাকা যায় না। বলে ঘরটায় ভিড় জমে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, পেছনে বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখল পাড়ার যত মেয়েরা-ছুকরি, জোয়ান, বুড়ী। রহীমা পর্যন্ত না দেখে পারল না। স্বামীর কীর্তিতে উজ্জল হয়ে ওঠা চোখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও মুখে আঁচল দিয়ে খানিকট হাসল।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বা পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে

সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারের গ্রাম নিশ্চল। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুতা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহকবতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখা-প্ৰশাখা মেলে সারা গ্রামকে আছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে। সবলভাবে। প্ৰতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্ৰভেদ আছে। আজ অপরাহ্নে যে-দুটি লোককে মজিদ কষ্ট দিয়েছে তারা নির্ভেজাল কষ্টই পেয়েছে। সে-কষ্ট পাওয়ার পেছনে ক্ৰোধ নেই, ঘৃণা নেই। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক; প্ৰতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে ঘৃণা, প্ৰতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্ৰতিফলিত হয় রহীমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহীমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ী পেচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত-সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্ৰথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্য ভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তুৰ্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছেয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা।

রহীমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিনিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিৎর সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোনো বেয়াদপি করে বসে সে-ভয়ে বুক কঁপে ওঠে। কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, কোন মানুষ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন-যাঁর ক্রহঃ এখনো মানুষের দুঃখ-যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?

কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহীমা একটা আৰ্জি জানায়। বলে তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খা-খ্যা করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আজি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায় সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে।—না-হয় লজ্জা, নাহয়। দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এই সময় দমকা হাওয়া ছোট্টে, জঙ্গলের যে কটা গাছ আজও অকতিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালু কাপড়ের প্রান্ত নাড়ে, কঁপে ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রূপালী ঝালর। রহীমাও কঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয়, কে যেন কথা কইবে আকাশের মহা-তামিস্রার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে। ওপরে আকাশ-ডরা তারা তেমনি নীরব।

কোনোদিন রহীম। সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার ছনুর বাপ মরণরোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে।—তার ওপর করুণা করে। কারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপর করুণা করে, রহমতা করে। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে,

ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।

অনেক সময় অদ্ভুত আৰ্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহীমার কাছে। যেমন আসে ধান ভাননি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিল, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

-আমার এক আৰ্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহীমার হাসি পায়। কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

-আমার আৰ্জি-ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহীমা বলে,

-ক্যান গো বিটি?

-জুলা আর সইহ্র হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সস্তর দুনিয়া থিক। লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহীমা প্রশ্ন করে,

—তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিকে তার ভারনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।

—তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু।

রাহীমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

—আমার এক আৰ্জি বুবু।

-কও?

-ওনারে কইবেন-বুড়াবুড়ী দুইগারে যানি দুনিয়ার খান লইয়া যায় খোদাতালা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহীমা প্রশ্ন করে,

-ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

—হ, খাটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলচুলি আর ভালো লাগে না।

বুড়ো বাপ তার চেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কেঁকড়ানো। কিন্তু দু'জনের মুখে বিষ। ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনখুনি হবার জোগাড়। চেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ী ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাপিয়ে ঝাপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না তখন শেষ অশ্রু হানে।

-ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী-হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না!

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে; আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের-কাদের, আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘেরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে আর বর্ষায় টেকে। কিনা সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্বেষে কাঁপিতে কাঁপিতে বুড়া বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

-হনছস কথা, হনছস?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,-ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,-থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি দিবো।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উক্তি শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহীমাকে এসে বলে কথাটা।

-হয় বুড়াবুড়ী দুইটাই মরুক-নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার।

হঠাৎ সমবেদনায় রহীমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,

—তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুঃস্থা মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিন-তিনটে মর্দ ছেলে বসে বসে খায়। এক মুঠোর মতো যো-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো এক নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহীমা বলে,

-শ্বশুর বাড়িতে যাও না ক্যান?

—অরা মনুষ্য না।

-নিকা করে না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুঝু।

জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গায়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অগ্নিরে তার রঙ ধরে। বতোর দিনে বাড়ি বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই। মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশ মেজাজে

বলে,

-শরীলে রঙ ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ী আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,-খানকির বেটি নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে,-গিলা খাইছি। মা-বুড়ী আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিত।

দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্য আসে পথভোলা অন্ধ হওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায় : নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুষকে পেলে করে কী? তেল চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো ব্যাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে,- তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধমকে ওঠে।

-কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ে বলে,-তা হজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যামনে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারী গলায় বলে,-আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মদ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোনো হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে, চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়ীকে শেষ করবার জন্যে। এর মধ্যে একদিন হয়তো সে শেষই হয়ে যেত—যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিত। কিন্তু সে কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আশ্তে বলে,-বুড়ীর দেমাক খারাপ হইছে হজুর। আপনে যদি দেয়া পানি দ্যান...

আবার কতক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

-বিবিরে কইয়া দিও, অমন কথা যদি আর কোনোদিন কয় তাইলে মছিবং হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,- হজুর, কোথিকা হনলেন বেটির কথা?

-তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ে। কে বলল কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিল। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাৎষয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমি সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা-মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃশ্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি, যা দিয়ে একজনের পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দু'চোখের বিষ মনে হয়। বুড়ীটার হয়তো তার ছোয়াচ লেগেই আমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফট মেয়ে ছিল সে। স্থির থাকত না এক মুহূর্ত, নাচত কেবল নাচত, আর খই-এর মতো কথা ফুটত মুখ দিয়ে। আজ তার সুন্দর দেহমান পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ী যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশীদিন নয়। সাধারণ গালগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আশ্রয় গিয়ে খচ করে লাগে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্ৰচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে। অগ্নিরটা।

বুড়ে ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবে কি হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অগ্নিরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা তত জ্বলে ওঠে। বুড়ে। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না।-তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে? এককালে বুড়ী উড়নি মেয়ে ছিল, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হতো কত লোক। বৈমাত্রের ভাইটির সঙ্গে ঝগড়াবিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব উঠেছিল। একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে কাণ্ডটি নাকি ঘটেছিল। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙনি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তা দুই প্রকৃতির বৈমাত্রের ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড়াচড় করে মেজাজ গরম হয়ে উঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়ার মুখে ফেনা উঠে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা।-ওরে ভাতারা-খাইগা জারুণি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রহারের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিল না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। বুড়ী অবশ্য আঁধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাংর বুড়ে নয়।

সে-দিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেল মজিদের বাড়ি। মজিদ। তখন জিরুচ্ছে আর সে-ঘরেই নীচে পাটিতে বসে রহীমা কাঁথায় শেষ কটা ফোঁড় দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহীমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিলো। প্রথমে কিছু বোঝা গেলো না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এইটুকু বোঝা গেলো যে, সে রহীমাকে বলছে; ওনারে কন, আমার মওতের জন্য যানি দোয়া করে।

মজিদ হুঁকা টানে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরত মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে এমন একটা বউ-এর স্বপ্ন দেখত প্রথম যৌবনে। রহীমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা! অপরাধ, না করে থাকলেও মজিদ বলেছে বলে যে-কোনো কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এই জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গভীর কণ্ঠে রহীমাকে বলে,-অরে। যাইতে কও। আর কও আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহীমা বলে,-ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠি দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নথ দিয়ে মাটি খুটিছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্যে। এক মুহূর্ত কৌতুহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গভীর কণ্ঠে বলে-থাক তাইলে এইখানে।

০৩. অপরাহ্নে জমায়েত হয়

অপরাহ্নে জমায়েত হয়। এক বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেঙা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাস্তা, অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতববর না হলে শাস্তি বিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতববরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে মাটিতে বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারী বাজখাই গলায় প্রশ্ন করে,-তোমার বিবি কী বলে?

মুখ না তুলে বুড়ে বলে,-হেই কথা আপনার ব্যাক্সই জানেন।

কে একজন গল উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,-এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকপার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো-এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,-এইটা কি কওনের কথা? বুড়ীমাগী বুটমুট একখান কথা কয়-তা বইলা আমি কী পাড়ায় ঢোল-সোহরাত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্ৰত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধমকে উঠে বলে,-কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেটিয়ে ওঠে,-কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও।

বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারী আবার বলে,-তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান?

-আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি!

-লম্বা মুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয়-ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে—বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরী হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুঝিয়ে বলেছিল সে, এবং ভেবেছিল তার পক্ষে থেকে খালেক ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমতে চালিয়ে নেবে কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে,—ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় ছুবাক্ষ ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেক বার ভাই সকল বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতালার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই; দোষগুণে তৈয়ার মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেস্তুও আছে। তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনোটো বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চতুরী বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে।—তারা এইসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু, সে-রসন বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রকৃষ্টিগত সে-রসন তার বিয়ে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমস্ত পৃথিবীতে।

ঋজু ভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ, কারো দিকে তাকায় না। সে। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে,

—পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসন প্রকৃষ্টিগত হয়েছে। পঞ্চম হিজরীতে প্রিয় পয়-গম্বরের নিকট বাণী এল; মুস্তালিখ*-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কি করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁট প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব-যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠল। হজরতের এত পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটতে লাগল। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এরা খোদা পরওয়ার-দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতালা মানব জাতিকে বললেন—

থেমে বিসমিল্লাহ পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেবাত করে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেবল বন্ধ করে, করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়, যে-লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়ে ছিল, তারও চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ভূত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নামায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গল উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতালার ভেদ তীরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ভূত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপনি সংসার, আপনি বালবাল দুনিয়ার সব চাইতে পিঁয়। তাদের সুখ-শান্তির জন্যে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপনি সংসারের ভালোই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে-মেয়েলোক আপনি সংসার আপনি হাতে ভাঙতে চায় এবং আপনি সম্ভানের জন্ম সম্পর্কে কুংসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়—তার গুণাহ বড় মস্ত গুণাহ, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝনি করে ওঠে।

—তুমি কী মনে করো মিঞা? তুমি কী মনে করে তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস ঠাসা জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ—এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়াই পাখীর মতো নাচত, হাসিখুশি উজ্জলতায় চারিদিকে আলো ছড়াত, তখন যে জনরব উঠেছিল সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালুক দিতে পারত। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাত না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিল, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচন ধরা মাংসের রদি খোলস—তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে। কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,—কী মিঞা? তোমার দিলে কী ময়লা আছে? তুমি কী ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধনিশ্বাসের স্তব্ধতা নামে, এবং সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেবালের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কত হয়ে ওঠে। সে-ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, পর্বাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ী বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যেই অমন বুটমুঠ কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,—কী কমু? আমার দিলের কথা। আমি জানি না। ক্যামনে কমুদ দিলের কথা?

—কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ কুলে পড়েছে, থাই পাচ্ছে না

কোথাও।

—তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দাঁড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদন হয় না; বরঞ্চ তাকে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছটফট করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঝজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহুর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্ত্র বরণার মতো বেয়ে বেয়ে আসে, ঝরে ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়!

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজী বৃদ্ধ লোকটি কঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, কেউ ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত্র গলায় বলে,—তুমি কিংবা তোমার বিবি গুণাহ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাফ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখব। আর মাজারে সিন্নি দিব পাঁচ পইসার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবী করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তালিম করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ীর কথায়। সে-কথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিস্কারভাবে বলে এসেছে সে-কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিনীর আপনি মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়াচড় করে ওঠে। ভাবে, উঠে গিয়ে চেলাকাঠ দিয়ে এ মুহুর্তেই বুড়ীর আমসিপান মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ ছেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধূলিস্মাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠেই না। বুড়ী মাঝে মাঝে শান্ত্রগলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,—দেখত, ব্যাটা মরল নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কী যে কও! মুখে লাগাম নাই তোমার?

হতাশ হয়ে বুড়ী বলে,—তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বড় ভয়ে ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে বলেছে, কিন্তু একবার হাতে নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ে। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে, উকি মেঝে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো কখনো। কখনো বা আড়াল থেকে শুঙ্ক গলায় প্রশ্ন করে,—ব্যাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দুদিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হওয়া আর দলে-ভারী কালো কালে মেঘে লড়াই লাগে; মহরতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখীর মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখীর মতো শো করে নেমে আসে, কখনো ভেঁত। প্ৰশস্ততায় হাতীর মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মার হৈ হৈ করা অ ভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেলো রে, ছাগলটা কোথায় গেলো রে, লাল কুটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেলো রে; তীক্ষ্ণ গলায় চঁচামেটি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে। হ-হ করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুজে পায় না। পেছনে ঝোপঝাড় দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুরকুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য শূন্য ঠেকে। বলে,—আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগাব করে খায়। ক্ষিধে রাক্ষসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিড়ে কটা গলাধঃকরণ করে বলে,—পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজ়ে সপসাপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে।

বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়। তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,—আর চাইরডা চিড় দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দুদিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা দুঃখের মধ্যে সে-অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে—মাইয়া তোর কাছে মাফ চাই। বুড়া মানুষ মতিগতির আর ঠিক নাই! তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে দাড়াতেই চোখে আরো পানি আসে হ-হ করে, অথহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সে-দিন সন্ধ্যায় বুড়ে চলে গেলো। কেউ বলতে পারল না গেলো কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই।

খরশ্রোতা বিশাল নদী, সে নদী কোথায় কতদূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ী স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তাঁর মৃত্যুর জন্যে এত আগ্রহ দেখাত সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি মধুর কোরান তেলাওয়াৎ শুনেছে অনেকদিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,-আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ী তখন জেগে উঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা...।

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ-যার অর্থ অনেক সময় খুজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে।-সব খোদা ভালোর জন্যেই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গুঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্যে নয়, তার জন্যে কৌতুহল প্রকাশ করা অর্থহীন!

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে উঠেছে কিনা জানিবার জন্যে কৌতুহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিলুপ্ত কৌতুহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে-প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাশীল অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থাই পায়, না। যেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসল হওয়া-না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা। কতখানি আর কৌতুহল জাগতে পারে! যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিল, পাপের জন্মালয় কেমন অস্থির করেছিল -যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধূলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছিল সে-কান্নার মধ্যে।

এ-বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশী জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবী করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চিরনীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লভ্যনীয় রহস্য আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহারহস্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখদুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে। আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়-সে-কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মা'র মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুজে পায়।-খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে।

তারপর মা'র প্রতি অগ্নি দৃষ্টি হানে।

-বাম আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল। বুড়ী কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।

প্ৰথম প্ৰথম হাসুনিৰ মা মজিদেৰ বাসায় আসত না। লজ্জা হতো। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্ৰমে ক্ৰমে আসতে লাগল। কখনো কাচিৎ মজিদেৰ সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাড়াত, আর বুকটা দূৰুদূৰু কঁপত ভয়ে। বতোর দিনে এ-বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেলো তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনা সামনি হয়ে গেলে। মজিদেৰ হাতে হঁকা। হাসুনিৰ মা ফিৰে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে, -হঁকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূৰ্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হঁকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধকধক করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হঁকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূৰ্ত সেটা ধৰে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে, আহা!

তার গলা বেদনায়ু ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্ৰমে ক্ৰমে সে খোলা মুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজেৰ অন্ত নেই। মানুষ তে রহীমা আর সে। ধান এলানো মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা-কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনিৰ মা তার পুরানো আজি জানায়। রহীমাকে বলে,-ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহীমা কষ্ট স্বৰে বলে,-অমন কথা কইওনা, ঘৰে বালা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রঙ, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনিৰ মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,-আমার শাড়িৰ দৰকার কী বুঝ? হাসুনিৰ একটা জামা দিলে ও পরত খন।

হঠাৎ কী হয়, রহীমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসে। আজ হাসেও না।

০৪. পৌষেৰ শীত

পৌষেৰ শীত। প্ৰান্তৰ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কঁপায়। গভীর রাতে রহীমা আর হাসুনিৰ মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে। সারা উঠানটা; ওপরে আকাশ অন্ধকার। গানগনে আগুনের শিখা যেন সেই কালো আকাশ গিয়ে ছোয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপেৰ। যেন শতসহস্ৰ সাপ শিস দেয়।

শেষ-ৰাতের দিকে মজিদ ঘৰ থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপা জোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্ৰতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সেই ঈষৎ লালচে উঠানেৰ পশ্চাতে দেখে হাসুনিৰ মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্ৰাভায়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধেৰ খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদেৰ চোখ এখানে অন্ধকাৰে চকচক করে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ। আশপাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে সিরসির করে। তাই শোনে আর আশপাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর। হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলি।

এক সময়ে মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে-রহীমাকে সে লক্ষ্য করেনি, সে-রহীমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহীমা ঘরে এলে মজিদ বলে,—পাটা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহীমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্থবিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,—ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করন লাগবো।

—থোও তোমার কাজ। মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহীমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারী হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ।

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কী কোনো কথা? তারই দেওয়া বেগুনি রঙের শাড়ি-পরা মেয়েলোকটিকে—খড়কুটোর আলোতে তখন যার দেহের কতক অংশ জ্বলজ্বল করছিল। লালিত্যে—তাকে একটা কথা জানাতে চায় যেন। তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাসীল প্রভুত্ব অস্থির অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করেছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহীমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিল, ধান সিদ্ধ হয়েছে কি-না। সেও তাকায় না রহীমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পূর্ব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, স্নগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে উঠে। মজিদ। কখন উঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গবীষ্ম প্রভুত্বের বিবির বিবির হাওয়ার মতো ভেসে আসে।

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নোতুন। এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তার নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ। কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা।

মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগরার পর মগরা ধানে ভরে উঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়াল। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বলে আর তানার দোয়া।

শুনে কারো কারো চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগরাগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরো-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারো কারো বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়-বষিট না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মতো লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারী কী তার কাজ? খোদাতালা অবশ্য দুনিয়ার কাজকামকে অবহেলা করতে বলেননি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রাসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারী ভালো লাগে?

—বলে মজিদ চোখ পিট পিট করে—যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে। যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে, —খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে-রহমতের জন্যে সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজার করে। কিন্তু আবার দু-মুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যারা প্ৰাণ-মন-দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াঙ্কল করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিংব হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে পরে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

কিন্তু আজ সকালে মজিদের সে-চোখে একটা জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে থেকে থেকে। গনগনে আগুনের পাশে বেগুনি রঙের শাড়ি পর একটি অস্পষ্ট নারীকে দেখে। স্মৃতিতে তার উলঙ্গ বাহ ও কাঁধ আরো শুভ্র হয়ে ওঠে। তার যে-চোখে দিগন্তপ্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,—তোমার কেমন ধান হইল মিঞা?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি ঘাড় চুলকে নিতিবিতি করে বলে—যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মণ। ধান হলে অন্তত একশো মণ বলা চাই। বতোর দিন উচিয়ে উচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয়নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কী হবে বুঝে না উঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা বলে মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে তারই শিখার উতাপ অনুভব করে। সে-উতাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। এবং যে-আগুন জ্বলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই।-গৃহস্থদের গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময়, খাতির-যন্ত্রটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দু'দিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা। হয় না পীর সাহেবদের।

দিন কয়েক হলো, তিন গ্রাম পরে এক পীর সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর পুরানো মুরিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

প্ৰচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এই দূর দেশে আসেন। সে কতদিন আগে তা পীর সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞতা স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়। যে দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেইকেবল বৃহৎ খড়গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তরভারতে কোনো এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দু জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পীর সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তার সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে-গল্প তাঁর রূহানি তাকত ও কাশফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো খোনকার-মোম্মার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উচুতে, কিন্তু রূহানি তাকত তার নেই বলে অন্তরে অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা ব্যক্তি করে। কিন্তু এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে তা মহৎ ব্যক্তির দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মজিদ নিশ্চিত থাকে।

কিন্তু জাঁদবেল পীররা যখন আশেপাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন কিন্তু মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আশ্রয় শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। অতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী। প্রশংসা করে। বলে, খোদাতালার ভেদ বোঝা কী সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে। থমথম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পীর সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পীর সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের

পর দিন ডিড ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিহিত গিয়ে তার নূরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারো চোখ ঝলসে যায়, কারো এমন চোখ-ভাসানো কান্না পায় যে, আর এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পীর সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারী বুকুর হাওয়াও লাভ করে।

রাতের বিছানায় শুয়ে মজিদ গভীর হয়ে থাকে। রহীমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে, —আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহীমা হঠাৎ বলে,—এক পীর সাহেব আইছেন না হেই গোরায়ে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,—মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতুহলের নয় দেখে রহীমা দমে গেলো। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক সময় রহীমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে, ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নিষ্পাদি বোকামির জন্যে আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্যে একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা, উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

এক সময় ভাবে, ঝালার-দেওয়া সালু কাপড়ে আবৃত। নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায়। তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রী করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর স্বপ্ন, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ দুটি চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা উঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহীমার পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচাইন। একটি হাঁটু উলঙ্গ হয়ে মজিদের দেহ ঘেষে আছে।

তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছলো তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার বাড়ির

সাননেকার মাঠ লোকে-লোকারণ্য। তারই মধ্যে কোথায় যে পীর সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশকিল। মজিদ বেঁট মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পীর সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু জন-সমুদ্রের উত্থাপে পীর সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতীর কানের মতো মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক; কেবল সেই পাখাটা থেকে থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ডিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ্য করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ডিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্য্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় পৃথিবীর আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পীর সাহেব আজ দফায় দফায় ওয়াজ করেছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বিশাল বাপু দ্রুত শ্বাসের তালে তালে ওঠা-নমা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিলু-বিলু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময় পীর সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিঞা হজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে হয়তো তিনি এমন এক জরুরী কাজে আটকে আছেন যে, ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুলি নড়তে পারে না! শুনে কেউ আহ-আহ বলে, কারো-বা। আবার ডুকরে। কান্না আসে। কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে।

আধা ঘণ্টা পরে শীতল দ্বিপরাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমিয়ে এসেছে, এমনি সময়ে হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠল। একটা ঘোষণা মুখে মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল।—গীর সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পীর সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ প্ৰতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠেছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্ৰান্তে শোনা যায় না। কিন্তু, মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পীর সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধা ঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বায়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকীটা বলেন—সোহবতে তোয়ালে তুরা তোয়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খরাপ করে)।—তখন গোটা জমায়েতেরই সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পীর সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল হয়ে ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখ-সঞ্চালন দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পীর সাহেবকে ঘেরাও

করে ফেলল। হঠাৎ পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারল ধরলকেউ পা, কেউ হাত, কেউ আঙ্গিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটল। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পীর সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ঋষদন্ডরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এই আক্রমণ তাঁর বোধ হয় স্পষ্ট হলো না। তিনি হঠাৎ নিজেই ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায় হায় করে উঠল। পীর সাহেবের সান্নিপাত্তরা আর তা শুনে জমায়েতও হায় হায় করে উঠল। সান্নিপাত্তরা তখন সুর করে গীত ধরলে এই মর্মে যে, তাদের পীর সাহেব তো শূন্যে উঠে গেছেন, এবার কী উপায়?

পীর সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারী পা দোলাচ্ছেন। ফাণ্ডনের আণ্ডনের দ্রুত বিস্তারের মতো পীর সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে না দেখতে ছড়িয়ে গেলো। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে উঠেছিল, এবার তারা মড়া-কান্না জুড়ে বসল। পীর সাহেব কী তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অঙ্ক মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারী ঢেউ-এর মতো সম্মুখে ভেসে এল জনশ্রোত। অনেক মড়া-কান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পীর সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পীর সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, —ভাই সকল, আপনার সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেলো।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সাবা মাঠটা যেন কেঁপে উঠল। শতশত নামাজ-রত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গল আর্তনাদ করে উঠল।

সে-কণ্ঠ মজিদের।

—যতসব শয়তানি, বেদাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্কারা! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সান্নিপাত্তদের তিনজন এগিয়ে এল। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, —চাঁচামিচি করত কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,—কোন নামাজ হইলো এটা?

—কাহে? জোহরকা নামাজ হয়।

উত্তর শুনে আবার চীৎকার করে গালাগাল শুরু করল মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সান্নিপাত্তরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পীর সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে এলেম শিখে এসেছে, সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু, ভাদ্রমাস

থেকে ছায়া আসলী এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু, দুকদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময়ে আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পীর সাহেবের সান্নিপাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না। তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ থিস্তি করে বললে,—কেন, তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারল না সুরুঘটারে?

তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,—মহরতনগর যাইবেন কে কে?

মহরতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কারো মনে ভয়ও হয়েছিল।—এই বুঝি পীর সাহেবের সান্নিপাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে একে তারা ভিড় থেকে খসে এল।

মতিগঞ্জের সড়কে উঠে ফিরতিমুখো পথ ধরে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিশ্বাসের নীচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটিতে লাগল। সঙ্গে লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটার দ্বন্দ্ব দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রদ্ধার গুঁহু রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরী বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকাল। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অখচ পবিত্র ক্বেধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মুখ, বিপথচালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য পেশ করল।—ভাই সকলরা, সকলে অবগত আছেন যে, বেদাতি কোনো কিছু খোদাতালার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্ৰলুব্ধ করবার জন্যে মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশল সহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেবী হয় না। তাছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্যে তার সমস্ত কারসাজি ভঙুল হয়ে যায়। তা হলো বেদাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেলো, তাহলে তার শয়তানি রইল কোথায়।

ভনিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে।—আউয়ালপুরে তথাকথিত যে-গীর সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্ৰমাণিত হয়। মুখোশ তার ঠিকই আছে— যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তাঁর কবলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সেই উদ্দেশ্যই তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্যে খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্ৰতিদিন মকরুহ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ—যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ কাজ করেননি তাঁরা খোদার কাছে গুণাহ

করছেন।

এই পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ। কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজাখাই গলায় প্রস্ন করে, হনলেন তো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোনো মানুষ পীর সাহেবের ক্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেলো যে না, তা নয়। কিন্তু গেলো অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদী জোশে বলীয়ান হয়ে পীর সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেলো দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতা বগলে করিমগঞ্জ গেলো। হাসপাতালে। আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিষদভাবে বুঝিয়ে বলল, বেহেস্ত ও দোজখের জলজ্যন্ত বর্ণনাও করল। কতক্ষণ।

কালু মিঞা গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দুফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে, মস্ত ব্যাণ্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর সুললিত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিঞা শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউণ্ডারকে ডাক্তার মনে করে বলে,—পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে! ওদের যন্ত্র নিলে আপনারও ছোয়াব হইবো।

ভাঙ-গাঁজা খাওয়া রসকম্পশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউণ্ডারের। প্রথমে দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাকাতে ঝাকাতে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিঞার বাপের সঙ্গে দুচারটি কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুক তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,—কোনো চিন্তা করবান মিঞা, খোদা ডরসা। তারপর বলে যে, হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদর ময় হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতাই শাহী কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা লেবা শুশ্রূষার শেষ নেই।

খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরো শোনায যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বললেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযন্ত্র বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যে কথা কয় বলে মনে মনে তাওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়; দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কি-না তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

বাইরে নিরুদ্ভিগ্ন ও স্বচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-গীর সাহেব আস্তানা গেড়েছে তিনি সোজা লোক নন। বহু পুরুষ আগে দীর্ঘ পথশ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুরা পরে যে লোকটি এ-দেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটীর দেশের মেঘ পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পানসা হয়ে গিয়ে থাকলেও পীর সাহেবের শরীরে সে-ভাগ্যবশী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যায় থাকে। মজিদ। মহকুবতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই, আগেভাগে তার হৃদিশ পাবার জো নেই। সে-জন্যে মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাতদিন আরো খচখচ করে।

মজিদ ও তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কী হবে, তিনগ্রাম ডিঙিয়ে মহকুবতনগরে এসে হামলা করার কোনো খেয়াল পীর সাহেবের মনে ছিল না। তার প্রধান কারণ তাঁর জঙ্গীফ অবস্থা। এ-বয়সে দাম্ভারাজি হৈ হাম্ভামা আর ভালো লাগে না। সক্রোধদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ একটা জঙ্গী ডাব দেখালেও হজুরের নিষ্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পীর সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুতা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কী উলটে তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাকবেরদর নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এখানে আসে। তবে একহাত দেখে নেওয়া যাবে। সে-দিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্যে মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি প্রাণী। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্যের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মিরার মতো জোরাল। পীর সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তেরো বছর বয়সে বিয়ে করেছিল, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তনু বিবিকে ফি-বৎসর আস্ত আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সন্ত হয় না। দেখা সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পীর সাহেবের আগমন সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এবার হয়তো বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তনু বিবির কোলে যখন নোতুন। এক আগন্তুক ট্যা-ট্যা করে উঠবে তখন সেও কণ্ঠ কাতর করে বলতে পারবে, তার গাটা কেমন-কেমন করছে, বুক ঠেলে কেবল যেন বমি আসতে চায়। তখন নানিবুড়ীর ডাক পড়বে। শেষে নানিবুড়ী মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মীর শেষ কাটালে। কারণ যৌবনের দিক থেকে সে তনু বিবির মতো জোয়ার-লাগা ভরাগাঙ না হলেও একেবারে টসকোনো নয়, বাঁচা-চ্যাবকা কালো মানুষও নয়। রঙে ছাতা পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রঙ ধবধব করে, নাকে সতীনের মতো জুলজুলে নাকছবি না থাকলেও তা খাড়া, টিকালে। তার সন্তান আকাশের চাঁদের মতো সুন্দর হবেই।

কিন্তু মুশকিল হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্যে পেলোও তখন আবার জিহবা নড়ে না। ফিকির ফন্দি করতে করতে এ-দিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসল। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে

মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পীর সাবের থিক একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জুরজারি, পেট-কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

—পানিপড়া ক্যান? আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে।— তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে,-আইচ্ছা। কিন্তু পরীক্ষণেই মনে পড়ে যে, পীর সাহেবের িবসীমায় আর তো ঘোষা যায় না, অবশ্য পীর সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউ-এর খাতিরে পানিপড়ার জন্যে তাঁর কাছে যেতে বাধত না, কারণ পীর নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে নামকে অন্তরে অন্তরে লেবাস-মুক্ত করা যায় না। গাড়ুরি-চাষী-মাঠাইলারা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা স্বচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা। এবং সমাজের মূল হলো একটি লোক-যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনশ্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সম্ভানে না। জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে জন্যে সে ভাবিত হয়, দু'দিন আমেনা বিবির কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারী।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলামিঞা। বোকা কিচ্ছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায় দায় ঘুমায়, আর বোন জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বহরান্তেও। আড়ালে আড়ালে থাকে। কাচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কি হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়তো-বা শালার সঙ্গে খানিক মস্করাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারী বললে : একটা কাম করেন। ধলামিঞা?

ব্যাপারীর সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অস্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনোমতে বলে, -কী কন দুলামিঞা?

কী তার কাজ ব্যাপারী। আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথম বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভনিতাসহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আওয়ালপুর তাকে রওয়ানা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে, যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ গ্রাম থেকে গেছে। এ-কথা ঘূণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পীর সাহেবের দোয়াপানির জন্যে। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আক্ষীয়ার একটা ছেলের জন্যে বড় সখা হয়েছে। সখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হলো এই যে, শেষ পর্যন্ত কোনো ছেলেপুলে যদি না-ই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালাবার আর কেউ থাকবে না। মোট কথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাকে বুঝিয়ে বলতে

হবে যে, শুনে পীর সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরুবিবা। তবু ধমকে ধামকে কথা বলে ব্যাপারী। পরগাছা মুরুবিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা।

—কি গো ধলামিঞা, বুঝলান নি। আমার কথাডা?

—জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাৎ করে ধলামিঞা জবাব দেয়। প্ৰস্তাব শুনে মনে মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ পড়ে, এবং সবাই জানে যে, সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তরমতে দেবংশি।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কী একাকী ঐ তেঁতুল গাছের সন্নিহিতে ঘোষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিল যে, যে-সব দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুল গাছের ফাঁড়িটা কাটলেও ঐখানে গিয়ে পীর সাহেবের দজলা সাদ্ধাপাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাত সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা, ধলামিঞা।

—ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।

—জি, কিছু না! তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারী বলে,—আরেক কথা। কথাডা যানি আপনার বইনে না। হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

—তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিঞা ভাবে, ভাবে। ভারতে ভারতে ধলামিঞার কালামিঞা বনে যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে। নলের হুকায় টান দিচ্ছিল, হঠাৎ সেটা নামিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে। হাঁটিতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার ঢঙে দেখে পথে দুচারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।—তারা ভবক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নীচু করে সে বললে,—আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে-দীর্ঘ ভনিতা সহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল, তারই ওপর রঙ ফেনিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে-ফুলিয়ে দীর্ঘতর কোরে ধলামিঞা কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপীড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলামিঞাকে ডেকে বলে দিলো, আওয়ালপুরে গিয়ে পীর সাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ। নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,—তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলামিএৰা হঠাৎ ফিচকি দিয়ে হাসে।

-আওয়ালপুর গেলে কি আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানি-পড়াডা দিব হে লোকটা? বেচারীর মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা! ধরছে তখন ফকির কাম কি ঠিক হইব?-আমি কই, আপনাই দেন পানিপড়াডা আর কথাডা একদিন চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়। তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলামিএৰার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,-
কী কন?

-কী আর কমু। এই সব কাম কী চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কী আইন-আদালত না মামলা-মকদ্দমা? দলিল দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতালার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলামিএৰার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পীর সাহেবের ডাণ্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়তো ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলামিএৰা বলে,-আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পীরের কাছে আমি যামু না।

—যাইবেন না। ক্যান? এবার একটু রুস্ত স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিএৰা। যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলামিএৰা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মৰ্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,-হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামুনে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলামিএৰার মতলব, শেষরাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পীর সাহেবের খেদমতে পৌছে দেবার জন্যে ব্যাপারী যে-ঢাকা দেবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবী-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

-তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য।

তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠাগের পিছনে বেহুদা ঢাকা ঢালন কী বিবেক-বিবেচনার কাম? ঢাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবুও মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিম্নরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে,—না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলামিএৰা বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। বিবির খাতিরে ব্যাপারী মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ কোরে সেই ঠগ-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্যে।—সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতো। ধলামিএৰা ভারী মুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারীর বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নোতুন। এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কোন্ঠিতে, ততক্ষণ দুজনে গরু ছাগলের কথা

কয়। দু'এক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে! মজিদের ধামড়া গাইটা পোট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহীমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে মজিদ। তারপর এক সময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,—হেই পীরের বাচ্চ পীর শয়তানের খবর কী? এহনো ঈমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাকে না সট্কাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারী ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারীর মনে হয়, তামাকের ধোয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

-কী জানি, কাইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারী উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধরসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়তো গেছে গিয়া।

মজিদ আস্তে বলে,—তাইলে আর তানার কাছে লোক পঠাইয়া কী করবেন?

-লোক পাঠামুতানার কাছে! বিস্ময়ে ব্যাপারী ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে বসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙ্গা করে তুলে ব্যাপারী বলে,—হেই কথা আমিও ভাবতামি। আছে কী না আছে—হুদাহুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে। ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন বোঝান আর কী। ঠগ পীরের পানিপড়ায় কী কোনো কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে বলে বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু।

কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুঁকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোয়া ছেড়ে চোখ। গম্ভীর করে তোলে।

ব্যাপারীর মতো বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়—শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরো বলে যে, ধলামিঞাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে—ঘূণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ-গ্রামে কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে। কারণ, তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

-ধলামিঞাকে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ভূয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই...

মজিদ বাধা দেয়। ধলামিঞার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,—খালি আমার দুঃখটা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিক ঠগ-পীর বেশী হইল? আমার মুখে কী জোর নাই?

—আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হেনে তাতেই ঢলে।

-কথাটা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কি, তাগো কথা হনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারীর মস্ত গোফে আর ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,—ঠিকই কইছেন কথাটা। কিন্তু কি করি। এহন। কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

-তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পূর্ণ নোতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাৎ কৌতুহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে। ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,—পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চোদ্দ। একুশ বেড়িও দেখেছি। একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ান যায় না। আমার তো চোদ্দ প্যাঁচ।

ব্যাপারী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,—আমার বিবিরড ছাড়ান যায় না?

-ক্যান ছাড়ান যায় না। তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগবে। কয় প্যাঁচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে, মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে—তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহরী না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারে সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরীফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরীফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া-দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরী করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাঁক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,—আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

-তয় বুঝতে হইব যে, তানার চোদ্দ প্যাঁচ কি আরো বেশী। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরু ছাগলের কথা পাড়ে। এক সময় আড়চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরো দুচারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ উঠে পড়ে।

ফেরবার পথে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কঁঠাল গাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেবী আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেবী হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরো কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে, -কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিল, সে এবার মজিদের প্রস্নে আশ্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বিলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ী বেঠিকপানী ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাসখানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিল মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে, -কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাং ফ্যাং করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে, -মা মরছে!

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে, -আহা ক্যামনে মরলে গো বেটি?

-এ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ডেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ কবে না। মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে, -ছ্যামরারা কই?

-আছে! ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইবো।

-দাফন কাফনের যোগাড়িয়ন্ত্র করতাছে নি?

-করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়বে।

খেলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে। মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিত্তিত গলায় বলে, -মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিল নি তহর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

-মাফ চাইছিল কিনা কেইবার পারি না!

কয়েক মুহূর্ত মজিদ। নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ষিক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কেঁকড়ানো রাগ-ঝোলা যে মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিষ্পন্দভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদম গাছের তলে কবর দেওয়া হবে, তখন হয়তো দমকা হাওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে সে হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে-কবরে লোক চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করবে-এ-কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো

কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,

-মায়ের কবরে আজব হইবো?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাঁধে। থেমে বলে,—খোদা তারে বেহেস্ত-নাছিব করো, আহা!

একবার আড়াচোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়তো বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্যে লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে। যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটিতে শুরু করে মজিদ। বা ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজ হবে না তো?

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পীর সাহেবের পানিপড়া পাবে না জেনে প্ৰথমে নিরাশ হয়েছিল, কিন্তু পেট বেড়ির কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশী না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত কমতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হলো। আন্তে আন্তে একটা ভয়ও এল মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশী হয়, চোদ্দ কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউ-এর তো সাতের বেশী। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি; কিন্তু এ-সব কথা হলে বাতাসে কথা হতে শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি করে সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ে। মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুচ্চিত্রায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপাড়শীরা এসে দেখে দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সঙ্গে নীচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহীমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার ঘাসে পানি। এমন পানি নয়-পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহীমা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। এক সময় তানু বিবি প্রশ্ন করে, -বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন না?

-আমি দেই নাই।

-দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তা নু বিবি বলে।—তায় তানি ক্যামনে জানলেন। আপনার চোদ্দ প্যাঁচ?

রহীমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,—তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এ্যামনেই বোঝে।

-তয় তানি বোঝেন না। ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারী।

রহীমা মুশকিলে পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়! তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার

তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহীমা আস্তে বলে,—তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে বাড়িতে ফেরে রহীমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,—পড়াপানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

—না। যা পড়েছে তালাবের মধ্যেই পড়েছে।

সূর্য যখন দিগন্ত সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান-মদ দু'জন বেহারা পান্ধি এনে লাগাল অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

এক টিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারী হাঁকে,—কই তৈয়ার হইছেন নি?

আমেনা বিবি। আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিযে কোরান শরীফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহায়ায় তবু কিছু জৌলুম ছিল, এখন বেলা শেষের মান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে ঠেকে। তার চোখের সামনে আর্কাকাঁকা প্যাচানো অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে খারখারিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,—ওঠ বুকু সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামীর মতো আমেনা বিবি চমকে উঠে। ভীতবিহবল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরীফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেলা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে পৰায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তনু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা-নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাংস কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে যেন ভেঙে গেছে। গায়ে মাথায় বুটিদার হলুদ রংগের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকুর কাছে চেপে ধরে গুটি গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছেকণ্টায় যে-ভয় দীর্ঘ রোগভোগ করা মানুষের মতো তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারল সে যদি জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তবে কথা হচ্ছে কি, তেরো বছরের কথা একদিনে জানেনি, জেনেছে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে, প্ৰতি বৎসরের শূন্যতা থেকে। সে শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র ক্ষয়ে তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হাস পাবে, মনে কিছু-বা লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দুকদমের পথ ঘাস শুন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে-ভয়ের জন্যেই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে সেরা দয়ালু। সে খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে

অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি গুটি করে চলেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না। হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো বা পারত, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমা করে না। এ-সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে: বলে একবার ঘোষণা কোরে সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজই আত্মহত্যার মাল-মশলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করতে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদীপনার জায়গা নেই।

০৫. মজিদ অপেক্ষা করছিল

মজিদ অপেক্ষা করছিল। বেহারারা পালকিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখল।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে,—নামবো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,—তানারে নামায়া মাজার ঘরের ভিতরে লইয়া যান। থেমে বলে,—তানার ওজু আছে নি?

ব্যাপারী ছুটে যায় পালকির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,—আছে নি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

—তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সে চিকন সুরে দোয়া দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিংব সূক্ষ্ম কারুকায়ের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্ণতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পালকির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্যে আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে-পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকায় আরো সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে। তবু পালকি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়াচোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নেতুন বউ-এর মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় প্রিয়মাণ নোতুন, বউ-এর আত্মসচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মূহূর্তের জন্যে চোখটা আধাআধি খোলে। ঘরে ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিষে উঠেছে। দুটো মোমবাতি মানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোর সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালসালু কাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে-নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে-শক্তি

বিদ্যুৎ-চমকের মতো শতফলায় বিচ্ছুরিত হয়। প্ৰতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তশ্রোত যদি থেমেও থাকে। তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে। তথাপি মহা আকাশের মতো সে মাজার প্রগাঢ় নীরব, আর মহা আকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়াচোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে আমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্ম সুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

-তানারে বইবার কন।

ব্যাপারী বিবিকে বলে,-বহেন।

মাজারের ধারাটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে- সে আবার চোখ বুজে থাকে। মনে হয় তার শাস্তি, হয়েছে, আর আশা নেই। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ। বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়তো মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না। এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিল। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেওয়ায় হয়তো-বা তা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দত। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোনো আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে। তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্যে। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে-পা-ই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্যে। তার জিহবা লিকলিকা করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা-দেখে স্নেহ-মমতা উঠে না এসে, আসে বিষ। স্নেহ-মমতাই যদি গলাগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠত। তবে মজিদ রূপালী ঝালরওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেত। এবং যেত সেখানেই যেখানে নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবাণুভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, আসে। উন্মুক্ত বিশাল আকাশ পথে-যেখানে কাদামাটি লাগেনি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীত উদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধ্বসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি তার স্কুল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই ঠক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,—পানিটা দেন।

ব্যাপারীও তার লস্কু দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝঙ্কার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে। তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে।। পান করায় অধীরতা নেই। খোদার নামছোয়া পানি; তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষে নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির ম্লান আলোয় মনে হয়, সে-হাত শুধু সাদা নয়, অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে,—তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগবো।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

—আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডান দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায়। তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালো রঙের পাড়ের তল থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। একবার ডান পা আরেকবার বা। শব্দ হয় না। কাছাকাছি। যখন আসে তখন মজিদের ভেতরে সাপের গলাটা সামান্য চমকে পেছনে যায়, যেন ছোবল দেবে। মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আবে মিহি করে তোলে।

একপাক, দুইপাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে-স্তব্ধতায় বিন্দুমাংস প্ৰাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা-বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে-সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নেই। একটা প্রখর, অতু্যজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

একপাক, দুইপাক। তারপর তিন পাকে অর্ধেক। ক-পা এগুলোই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিলো। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করল, হয়তো-বা তাকে আলিঝালি দেখলোও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখল না, জানল না ক-প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানল না। মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, কপাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠত।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কণ্ঠে অর্তেনাদ করে বলে,—কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মুছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে

পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহীমা আসে না। আজি আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়তো আসত যদি না সঙ্গে থাকত ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারীটা দেখছিল। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিল। রহীমা মনে মনে স্থির করেছিল, পাক দেওয়াচুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখা করে যে ফিরনিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্পও করবে। নিজে সে স্বল্প-ভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যা-ই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটে দিয়ে রহীমা যে-দৃশ্য দেখল তারপর গল্পগুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। ব্যাপারীর লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো পাজাকোলে করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। সখ করে তৈরী করা ফিরনির কথা বা পান খেয়ে দুদণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেলো।

মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইল, দু'জনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দের ঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুঁকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেলো। দুজনেই এক এক করে হুঁকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানিপীড়া খাবার সখ হয়েছিল সে-আমেনা বিবির ওপর-আকার-ইঙ্গিতে বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও-মজিদের মনে একটা নির্ভুর রাগ দেখা দিয়েছিল। তবে একটা নির্ভুর শাস্তিও সে স্থির করেছিল। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে-প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নির্ভুরতমভাবে শানিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপ্ৰত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূছ যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিলো। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেলো, যে-মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখাল, তাকে নির্ভুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিলো না। দিয়েও দিলো না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখাল, সমস্ত আশ্ফালনের মুখে চুন দিলো।

হুঁকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারী কথা বলে। বলে,—দিনভর রোজা রাখতে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গভীর কণ্ঠে বলে,—রোজা রাখতে দুর্বল হইছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানিপীড়া দিলাম।—তা কিসের জন্য? শরীলে তাকত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপীড়ার যে পেটে গেলে একমাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই। মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারী মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,—তায় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

আপনে তানার স্বামী-ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারীর চোখ সন্ধিগ্ন হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ্য করে দেখে মজিদ। ব্যাপারীর চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনল-কণা। মজিদ আস্তে হুঁকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জ্যোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত—টাটকা লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান

জ্যোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্লেদ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা, হত প্রেমের নিশ্চুপতা।

আচমকা ব্যাপারী মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে। বলে,—কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কী কোনো কথা আছে?

একবার বলে বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,—না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার; তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে! তেরো বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্ন করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হ'কচাকিয়ে ওঠে তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের মান জ্যোৎস্নার পানে বেদনাজারী চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না। তখন সে আলাগোছে বলে,

-কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহর বাপের কথা মনে আছে নি?

ব্যাপারী ভারী গলায় আশ্বে বলে,—হে তহর বাপের কথা মাইনমের ভুইলা গেছে। এমন কী তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবোর পারি নাই। ক্যান জানেন?

যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারী প্রশ্ন করে,—ক্যান?

-কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইল। এই : পাক দিল আর গুণাগার দিল। এক সুতায় বাঁধা থাকে। আর কেউ যদি গুণাগার দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক দিলই শাস্তি পায়। তহর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে-বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালাক দেওয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুণাগার হয়েছে, পাপীও ভালো মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না। মজিদের হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—আপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?

সন্দেহের কোনো কথা নাই। পানিপড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মুছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইয়ের মতো সাফ। আর বেশী আমি কিছু কন্মু না। তানারে তালাক দেন।

এই সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাড়াল। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,-কী গো বিটি?

-তানার হুস হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন।

মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী উঠে দাঁড়াল। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পালকিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিলো।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে পাকি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেলো। তার মনের কথা জানা গেলো না।

হঠাৎ এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য-আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখল না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আচঞ্চিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়।

০৬. এতবড় সমস্যা ব্যাপারীর জীবনে

এতবড় সমস্যা ব্যাপারীর জীবনে কখনো দেখা দেয়নি। নিজের চোখে কোনো গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত। তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হতো না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে। এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেত, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানেনি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যেই তা খুলে বলতে পারেনি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারী কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুঁকার নীলাভ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরভৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হ-হা করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। এক সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্টনেস্ট হয় একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই, আরেকবার মনে হয়, সে শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহবা খসে আসবে। তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না। মুখ থেকে।

গ্রোবো বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলি-গলির সন্ধান করে। যদি

কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিল না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিল না; চলনে বলনে বেহায়াপনাও ছিল না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামী ভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হৃদয় দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমন কাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন। সব জানেন, কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে রঙ ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারী কী কখনো করেনি? ব্যাপারীর মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়তো অনেকে তা বিশ্বাস করবে: না। কিন্তু সে-কথা খোদাতালা ঠিক জানেন। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ডুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্থির করে ফেলে।

এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বাজাহত মন নিয়ে সে-দিনের পাক্ষিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায়নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পাক্ষির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসত। সেটা হলো খেতামখা তালগাছটা। বহুদিনের গাছ, ঝড়েপানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়ের থেকে ফিরবার সময় পাক্ষির ফাঁকি দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝতে যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিল নিশান, আনন্দের আর সুখের।

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জুলিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘরটা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রূপালী ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বলা যেন কম, উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে ঐখানে কেমন একটু অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রূপালী ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে সুতাগুলো খসে এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ডুরু কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে। তবে তা এই কয়েক গজ রূপালী চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে, এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দুবছর তিন বছর অন্তর মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয়, এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারই। খরচ করে তার আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেই শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরানো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্যে এ-গ্রামে সে-গ্রামে অনেক প্ৰাণী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রঙ ঢটে যায়, বা সালু-কাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার

প্রতি কী যে মায়া-তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহীম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্যে সারাদিন আজ মনটা ভারী হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কী ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্যে আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না। আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহীমা বিড়বিড় করে বলে,-তুমি এত দয়ালু। খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায যেন মাজারের সালু কাপড়টা ছেড়ে ফড়িফড় করে। মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারী। রূপালী ঝালারের বিবরণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাবের মিঞার ছেলে আক্বাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্বাস বিদেশে ছিল। বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়াতে না তামাকের আড়োত চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাটবেল টেব ভাব নিয়ে। মোদকের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকী জীবনটা নিশ্চিত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এই জন্যে আরো বেশী বোধ করল যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিল না। ছোটবেলা থেকে আক্বাস কিছুটা উচৰ্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত যোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুব্বিারা একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখল না। ভাবলে, বিদেশী হাওয়ায় মাথাটায় একটু গরম ধরেছে। তা দুদিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্বাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেলো। বলে, ইস্কুল দেবে। কোথেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বির স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কী দু-দুটো মজুব বসানো হয়নি? সে-কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্বাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগল চরকির মতো। ইস্কুলের জন্যে দস্তর মতে চান্দা তোলার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরাল গোছের আবেদন-পত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা। সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কথা এই যে, ইস্কুলের জন্যে সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। কোনো প্রকার ভনিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করল, -কী হনি ব্যাপারী মিঞা।

ব্যাপারী বলে-কথাডা ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আক্বাস এল, আক্বাসের বাপ মোদাকের এল।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্বাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্বাস কী একটা কথা বলবার জন্যে মুখ খুলেছে—এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এল। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রঙ। ঠাস করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলে,—তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্বাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্যে তৈরী হয়ে এসেছিল, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ইঙ্কুল হবে কী হবে না।—সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল আক্বাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারো ছাটা, কারো স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারো বা প্রচুর বৃষ্টিপানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সূরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,—তুমি না মুসলমানের ছেলে—দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্বাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুকুর্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাকের মিঞা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গা টিলা করে। এতক্ষণ সে নিশ্বাস রুদ্ধ করে ছিল এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড় ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাকের মিঞা বলে,—আমি কত কই দাড়ি রাখা ছ্যামড়া দাড়ি রাখ—তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারী বলে,—হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে?

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্বাস নাকি একটা ইঙ্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্বাস অমান বদনে উত্তর দেয়,—আপনি যা হনছেন তা সত্য।

মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,—তা এই বদ মতলব কেন হইল?

—বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজকাইল ইংরাজি না পড়লে চলবো ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার ওধার তাকায়। দেখে আক্বাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুফির কথা কেউ কী কখনো শুনেছে? শোনো শোনো, ছেলের কথা শোনো একবার—এই রকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হে করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্বাস মিঞা যে-দিনকালের কথা কইল তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতিগতির ঠিক নাই, খোদার প্রসিতি মন নাই, তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে!

সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার ক্রে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি। সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলম জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচ ওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকত আর শিরালি জপ তপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে,—মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরত—আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লাজশরাম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল, কিন্তু মজিদের একশ দরবার ভয়ে ও একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাক ছাড়ে,—ভাই সকল! পোলামাইনসের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে— তা নিয়া আর কী কমু। দেয়া করি তার হেদায়েত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরী ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গোরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মজি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুই-চারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্বাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তিবিধান হবে—এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেলো। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছসিত হয়ে উঠে বলে,—বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন।

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গোরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লীদের বুক যানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন—আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এক সময়ে আক্বাস ক্ষীণ গলায় বলে,—তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তো তলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

—চুপ কর ছ্যামড়া, বেতমিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্বাস আন্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্বাসের মতো খামখেয়ালী বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিঃপ্রয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হড়কায় কারো না কারো যেন যৎকিঞ্চিৎ হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না। করলেও গতির খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এই ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার এক সকাতির আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেওয়া হয়। তার জীবন আর কী-দিন। আর খায়েশ-খোয়াব বা আশা-ভরসা নেই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনা সে-দিন মাত্র ঘটল। কান-ঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্ৰশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নোতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাঁজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষ মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাশ্রমীর কোনো অন্যায় বুদ্ধি কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়তো দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,—ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে—এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখান আর অস্তই হোক—একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আত্মকালের বদখেয়ালের কথা ওঠ। কিন্তু মোদকেবর মিঞার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি আমন কথা ফের তোলে। তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা পাকা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরী হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রী কারিগর এসেছে, আর গতব খাটাবার জন্য তৈরী গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদাভাস আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিংব ঠেকে। তাছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে। এ-দেশ? দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাক-পড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্ৰবেশ করেছিল এই মহব্বতনগর গ্রামে। সে-দিন ছিল ভাগ্যবৈষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্ৰতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে এবং হয়তো ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে-চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

অ্যাজ দমকা হওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে। এবং তাই সারাদিন মনটা কেমন কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসাভাবে, কইতে কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া ছোট্টে। সন্ধ্যার পরে সে হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয় দরুদ পড়ছিল মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নামিয়ে এধার ওধার দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। রূপালী ঝালরওয়ালা সালু কাপড়টা এক কোণে উল্টে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, শ্রোণে, ভাসমান নৌকার চড়ে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাকুনি খায়। কারণ, ঘরের মান আলোয় কবরের সে-অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোল। চোখের মতো দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির, যশ-মান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরই; কিন্তু সে জানে না কে চিরঘুমে শায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্ৰায় অচেতন হয়ে উঠেছিল, সে কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উল্টানো নগ্ন ঃংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এ-নিঃসঙ্গত কালের মতো আদি অন্তহীন-যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাংস।

সে-রাতে রহীমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বপ্নভাষিণী রহীমা কোনো প্রশ্ন করে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে।

এক সময়ে মজিদই বলে,-বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহীমা কথাটার উত্তর খুজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে,-আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষি রাখি। কেমন মোটা-তাজা পোলা।

প্ৰথম মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,—নিজের রক্তের না হইলে কী মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া দেয়। মহড়া দেওয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মতো ভারী। যে-নিঃশব্দ তা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব। এবং কথা হচ্ছে, পুষ্টি ছেলে তো দূরের কথা, রহীমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে। যদি মনে নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্ৰয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,-আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিত!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মতো দেখাচ্ছিল। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ হয়েছিল

যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্যে শরীরের রক্ত পানি করা, আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরীফ পড়ে তখন তার অশা? আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকণ কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরান পাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে-তাতে যেন কোরান পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে অ।ওলাঘরের নীচু চালের ওপর রহীমা কদুর বিচি শুকাবার জন্যে বিড়িয়ে দিচ্ছিল। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়াচোখে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিত কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহীমাকে বলে,-বিবি, একটা কথা।

শুন্বার জন্যে রহীমা পা টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

-বিবি,আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম? সাথী মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহীমার এক মুহূর্ত দেবী হয় না। এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রাহীমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,-কী কও?

-আপনে যেমন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহীমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছুই নেই।

০৭. মজিদের দ্বিতীয় বিয়ে

জ্যৈষ্ঠের কড়া বোদে মাঠ। ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে। ঘামচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয়। এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, খানাপিনী মেহমান অতিথ-এর হৈহুলস্থূল হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে যে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নোতুন, বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে শাশুড়ির ডাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সাবক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যাত্রা দেখে তেওঁ ভোলা লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায় দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাঁড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশপাশ আ। তারের গন্ধে ভুর ভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,—হে নামাজ জানে নি?

রহীমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,—জানে।

—জানলে পড়ে না। ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহীমা সরাসরি উত্তর দেয়,—পড়বে আর কী ধীরে-সুস্থে।

আড়লে রহীমাকে মজিদ প্রশ্ন করে,—তোমার হে মানসন্মান করে নি?

—করে না? খুব করে। একরাতি মাইয়া, কিন্তু বড় ভাল। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দুজনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে—এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালী মিহিসুন্দর হাসির ঝঙ্কার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনেনি। রহীমা জোরে হাসে না। সালু আবৃত মাজারের আশেপাশে যারা আসে তারাও কোনোদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার বেল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হুহু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমক। হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝঙ্কার ওঠে না কখনো! এখানকার কথা ছেড়ে দিলেও, আগেই-ব। মজিদ কবে এমন হাসি শুনবে। জীবন গায়'লঘরের মতো। মজ্জবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবীর সামনে প্রাণভয়ে তার স্বাবে আমিসিপির পাড়া হতে শুরু করে অন্ন সংস্থানের জন্য তিন্তি তম সংগর মের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাংর আভাস নেই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশী টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,—কে হাসে অমনি কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুগ্নত শোনা যায়। তাই যো-জামিল মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওপরে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল। লজ্জায়, সে তাড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,—মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহীমা এবার ফিসফিস করে বলে,—হুনলা নি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে। একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহীমা পাট বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, 'আর অদূরে বেড়ার ওপরে বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে

অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে বনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে উঠে রহীমা বলে,-জোরে হাইস না বইন, মাইনসে হনবো।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিংবভাবে জীবন্ত সে হাসি, বারনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

আপন থেকে হাসি যখন থামে। তখন জমিলা বলে,-একটা মজার কথা মনে পড়ল বইলাই হাসলাম বুঝ।

হাসি থেমেছে দেখে রহীমা নিশ্চিত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন কবে,-কী কথা বইন?

-কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

-কও না!

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

-তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুঝ বেড়ার ফাঁক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

-কারে দেখাইছিল?

-আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দ্যুত, তুমি আমার লগে মস্তার কর খোদেজা বুঝ। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর-হঠাৎ আবার হাসির একটা দমক আসে, তবু নিজেকে সংযত কোরে সে বলে-আর, এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ী।

কথা শেষ করেছে কী আমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু সে-হাসি থামতে দেবী হলো না। রহীমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেলো।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে এক সময়ে জমিলার চোখ ছলছল কোরে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত উঠে। ভারী হয়ে থাকে। রহীমার অলক্ষ্যে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই কোরে জমিলা তারপর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহীম। যেমন চমকে উঠেছিল। তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা ঝোঁকে চোখ-নাক মেছে।

রহীমা আস্তে বলে,-কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহীমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্যে তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্যে মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহীমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিল এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী কোরে আসে সব সময়ে বোঝা যায় না। রহীমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।

জমিলাই কিন্তু দুদিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হৃদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে, কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে-পূর্বাহ্নে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহীমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানিবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোথেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়াল খ্যাংটাঙ্ক বুড়ী মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিলো। কী তার বিলাপ, কী ধারাল তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে যাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেলো। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোজ আনা পাঁচেক পয়সা বের কোরে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,-সব দিলাম। আমি, সব দিলাম। পোলাটার এইবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায়। তাকে-ছেলে মরেছে, তার জন্যে শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশী পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্ৰস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রাহ-এর জন্যে দোয় করা; সে যেন বেহেস্তে স্থান পায়, তার গুণাহ যেন মাফ হয়ে যায়-তার জন্যে দোয় করা।

কিন্তু এ-সব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ীর; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ কোরে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে, দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ্য-চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হাঁশ নেই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেলো। দুপুরের আগে মজিদকে নিকটে কোনো এক স্থানে যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, বুকে আসা চোখে আশপাশের দিশ নাই।

রহীমা বদনা কোরে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ, তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়াচড়া নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অথহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিাড়িতে এসে বসে। রহীমার হাত থেকে হুকটা নিয়ে প্রশ্ন করে,—ওইটার হইছে কী?

রহীমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গালের ঘাম মুছে আস্তে বলে,-মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হাঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,-কিন্তু-ক্যান খারাপ করছে?

রহীমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে-ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐ রকম কইরা বসে না।

মজিদ হুক টানে আর নীলাভ ধোয়ার হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না। তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে

থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কতী-তবে না হয় বুঝত মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরাতি মেয়ের আবার ওটা কী চণ্ড? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে। বলে, আমার দরজার থিক। উঠবার কও তারে। ও কী ঘরে বাল্য আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছিন্ন যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহীমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভেঁাতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আল গাছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিৎর ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কুল-কিনারাহীন অর্থই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো থিটথিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতল তার প্রমাণ পাবে-এই ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভয়, নির্মমভাবে আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শনের মতো চুল মাথায় বুড়টার ছুরি বা মতো ধারাল তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিদ্যুতের বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে মনে ক্ৰোধে বিড়বিড় কোরে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে!

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না; ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্ৰায় তার অভ্যাস হয়ে দাড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়তো এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্নিধ্যের জন্য বা মিষ্টি মধুর আশার কথার জন্য খা-খ্যা করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে-শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিক-ধিক কোরে জ্বলে, মনের অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনল? যার কচি কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল— তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারী হয়ে এল। তারই ভারি হওয়া চিত্তাক্রান্ত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেলো। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহ আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সোঁ-শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝল না, তারপর ধাঁ কোরে উঠে বসল। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে আকম্পিত হাতে দেশলাই জালিয়ে কুপিটা ধরাল।

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহীমা শোয়। সেখানেই রহীমার প্ৰশস্ত বুক মুখ গুঁজে জমিলা

অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপিটার লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল-যেন মাই খেতে খেতে ভুল থেমে গিয়েছিল, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হলো সে-কথা।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহীমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুষি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহীমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভন ভন কোরে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে উঠে রহীমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুষি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,-জমিলা কই?

-ঘুমাইছে বোধ হয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এই নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে উঠে ঢাকাঢোকা যা বাসী খাবার পায় তাই খায় গরগর করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,-ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইবো বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছে নি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিল, তবু টান হয়ে বসেছিল আধা ঘণ্টার মতো। তারপর কোনো প্রকারে এশার নামাজ সেবেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহীমা পেছনে ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে বান্না কবছিল বলে

-কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

-বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ঐসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া তাবে ঘুম থিক তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহীমা নিরুত্তরে ভুষি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভুষি খেতে শুরু করে, কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ড সে-হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহীমা, যখন ধীরে ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভঙে না। রহীমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরাল হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এই সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে রহীমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পোষণে মেয়েটির কাজার কচি হাড় হয়তো মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীতবিহবল হয়ে ওঠে। প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলে না। নামাজ যে পড়েছে, এ-কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না। কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে জামান্য করেনি। কোনোদিন। আজ তার ঘরের এক রাতি বউ-যাকে সে সে-দিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিল বলে-সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে আমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে-ক্বেদ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্বেদ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুসতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহীমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্মসংস্কারের সদৃশ্য কোমল আভি ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নির্ভুর হিংস্রতা।

ভীতকণ্ঠে রহীমা বলে,-ওঠ বইন ওঠ, বহত হইছে। নামাজ লইয়া কী রাগ করা যায়?

-রাগ? কিসের রাগ? মজিদ। আবার গর্জে ওঠে। এই বাড়িতে আহিলাদের জায়গা নাই। এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না। এর পর কী করবে। হঠাৎ এমন এক প্ৰতিদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে-সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে-সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,-ওর দিলে খোদার ভয় নেই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে প্ৰবৃত্তপ্ৰমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সিঁথি কাটছে। তেল জব্বজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া বোদের ঝলক লেগে জুলজুল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না। তার দিকে।

এ-সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছগাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে-দাঁতের আশে-পাশে, ওপরে-নীচে। ঘষতে-ঘষতে ঠোঁটের পাশে ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল কোরে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ যে যে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্ৰতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই।-মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। এক সময়ে সশব্দে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুর ঘাটে যেমন থাক থাক কোরে কাটা নারকেল গাছের গুড়ি থাকে, তেমনি একটা গুড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে, তারপর বলে,—রূপ দিয়া কী হইবো? মাইনুষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনেরই বা জীবন তার?

ক্ষিপ্ৰগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,—তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্যে হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিবো। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা কোরে বলে,—কাইল যে কামটি করছ, তা কী শক্ত গুণার কাম জানো নি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কী ডরাও না, দোজখের আঁগরে কী ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

—তাছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি! এই ঘর মাজার পাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তাঁনার রুহ-এর দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোসা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আর একবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিটা তেমনি সতর্ক, কান খাড়া কোরে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মতো। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্বে মুখ দিতে গিয়ে খট কোরে একটা আওয়াজ শুনে ইদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জুলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্তারিত হয়, দাউ দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সে-দিন বাদ-মগরের শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সে-দিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল মশলা পাঠাতে শুরু করে। সে-চাল-ডাল মজিদ ছুয়ে দিলে রহীমা তা দিয়ে থিচুড়ি রাধে। অন্দরের উঠানে সে-দিন কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় বড় ডেকচিতে বাগ্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল-মশলা এল ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের-আধাসের কোরে নানাবাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মশলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-চুলা গানগন কোরে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকেরা এসে বাহিরা-ঘরে জমতে লাগল। কে একজন মোমবাতি এনেছে কটা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপাশে রাখা হলো দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে এক গোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো একভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখাল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিঘৎ খানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এই যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে-নামতে শুরু করেছে।

টিমেতে তাল ঢেউয়ের মতো ভাসতে ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে .। এ-ধীরগতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্ভিন্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালু কাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীক স্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে দুনে চড়ে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে, এবং যে-মহা অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র, তারই ছিটেফোটা ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বারবার দেহ ঝুকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিধে যায় আর তার অন্তর-খনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট, বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এইবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মীম তা জ্বলে ছরখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিৎরতর হতে থাকে। হ হ হ। আবার; হ হ হ। আবার...

অন্ধরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহীমা-জমিলার ওপর। চাদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গানগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবজ্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন এক সময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে! বালুতীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা কোরে বসে, তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহীমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে, কিন্তু কানের পাশে গোজা

ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল; চোখ তার বাষ্পের মতো ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা, থাই পায় না কোথাও। শেষে সে রহীমাকে ডাকে,—বুঝ!

রহীমা শোনে কি শোনে না! সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এ-দিকে চেউয়ের পর আরো চেউ আসে, উতাল উত্তঙ্গ চেউ। হ হ হ। আবার; হ হ হ। দুনিয়া যেন নিশ্বাস রুদ্ধ কোরে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটি পরে চীৎকার ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পৰ্দাত প্রমাণ অজস্র চেউ ভেঙে ছুঁৰখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারে না। এবার ভেসে যাবে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা ভরসা।

বিদ্যুৎগতিতে জমিল উঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে,—বুঝ!

এবার রহীম। মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত • আপ নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে। কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে, উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা কোরে আফসোস করে, কেউ বা এ-হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ্য পদযুগল মত চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত কোরে দেয়। কেবল ক্ষয়ে আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটি লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েট নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাসূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো। রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে ধীরে সে উঠে বসে তারপর চোখে অথহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার দিকে তাকায়। এক সময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ কোরে জুলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী কোরে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,—পাগলী ঝিট। একটু থেমে আবার বলে, নোতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উচু গলায় মজিদ হাঁকে, এই বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সে-দিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জুলে।

হয়তো তার চোখের আগুনের হস্তু লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকের মাথা

দোলায় বটে। কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্ততায় নিষ্ফিণ্ড হয় গাছতলার দিকে। কঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা কোরে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,-
ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে,-আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্ৰচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবৃত্ত চুলার পাশে রহীম। তখনো বসে আছে, পাশে নামিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহীমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিঁধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এইবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ। কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপ কব্‌কশ গলায় প্রশ্ন করে,-হে কই?

রহীমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ উঠে চলে গেলো তারপর আর সে এ-দিকে আসেনি। আস্তে রহীমা বলে,-বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়ামিড় কোরে এবার মজিদ বলে,-ও যে একদম বাইরে চইলা গেলো, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহীম। জমিলা বাইরে গিয়েছিল? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে

প্রশ্ন করে,-হে বাইরে গেছিল?

তখনো দাঁত কিড়ামিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,-হ!

তারপর হনহানিয়ে ভেতরে চলে যায়। রহীমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সে-দিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিবৃত্ত হুঁকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিল মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্ৰোধ হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিশ্বাসরুদ্ধ-করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুন্ন আছে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাটে রহীম, নিঃশব্দে আর আলাগোছে। কিন্তু এ-দিকে তার মাথা বিম্বিম্ব করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম কোরে ওঠে। মনে মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মতো মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বালা ডেকে আনবে। আর মাজার-পাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে রহীমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকেবিবি, শোনো! তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাড়লে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহীমার মুখকে অস্পষ্ট কোরে তোলে। সে-দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর কোবে কেঁপে ওঠে।—বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিচ্ছিলো নি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহীমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুঃ কণ্ঠে উত্তর দেয়,—তওবা-তাওবা, কী যে কেন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহীম। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখ দুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মৃত্যুতের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙ-শূন্য নিষ্পৃহ মানুষ রহীমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য এপ্রবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো নিশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সপ্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহীমাকে বলে,—কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

রাতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কখনো এমন সহজ সরল পরমাস্বীয়ের কথা মজিদ বলে না! তাই ঝট করে রহীমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে উঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নোতুন। এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশীও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের সহবাসের ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন অস্বস্তি ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহীমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝামটা দিয়ে রহীমা বলে,—কী কামু মাইয়াড যানি কোমুন। পাগলী। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবো নি সব।

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে উঠে বাসি খিচুড়ি গোত্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেমেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়ে সারা সকাল কোরান শরীফ পাঠ করে। আজ নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছি! খালি তা না, তুমি তানারে নারাজ করছি। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার উপর তানার এংবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইবো। একটু থেমে মজিদ আবার বলে,—আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাখি দিয়া বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিত। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইবো, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তাব চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে

কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,—হুঁচ নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তার নিবাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কঠিন আরো রুক্ষ করে সে বলে,—দেখো বিবি, আমারে রাগাইও না। কইল যে কামটা করছি, তার পরেও আমি চুপচাপ আছি। এই কারণে যে আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্লেদ সংযত করে বলে,—তুমি আইজ রাইতে তারাবি। নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদছেহর। কাপড়ে ঢাকা মানুষবে কোরানের ভাষায় কয় মোদছেহর। সালু-কাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার-ঘরে। কখন তার অজু ভেঙে গিয়েছিল খেয়াল করেনি। মাজার-ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটা আওয়াজ কানে এল তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরুতেই মুহূর্তে সে-আওয়াজ থেমে গেলো। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ। হতভম্ব মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করল মাজার-ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেলে ভয়ে। আবার বাইরে গেলো, আবার এল ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজু নেই তার, নাপাক শরীবে পাক মাজার-ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজু বানিয়ে এল। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এল তখন অব কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু বিসর্জন করল মজিদ।

গল্পটা মিথ্যে। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যে কথা বলেছে বলে মনে মনে তওবা কাটে মজিদ। যা-হোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজার-পাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাভীর বজায় রাখলেও মনে মনে মজিদ কিছু খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

—তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় নাই।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জয়নামাজে ঝুঁটা বসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহীমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি। দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে। ওঘরে মজিদ হাঁকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। রহীমা অজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন ঘন হাঁকায় টান মারে আর চোখটি পিটপিট করে আশ্বাসচেনতায়।

রহীমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল

শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিরে সে-পা টেপে রহীমা, ঘুণধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে, তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হাঁকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে থেকে কঁচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে ঝঙ্কার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। একসময়ে রহীমা আস্তে উঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মতো ভার নামে। একটু পরে সহসা চমকে জেগে উঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা।—সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীরে ধীরে মজিদ ওঠে। ওঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে—এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না। কী করবে। তারপর সহসা আবার সেই চিনচিনে ক্ৰোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নেই। এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত কোরেও যার মনে ভয় হয়নি, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুত পদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাচক টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে উঠে তাকায় মজিদের পানে, প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্ৰোধে। রাতের নীরবতা এত ভারী যে, গলা ছেড়ে চীৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

—তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইবো না?

জমিলা হঠাৎ খারখার করে কাঁপিতে শুরু করে। ভয়ে নয়, ক্ৰোধে। গোলমাল শুনে রহীমা পাশের বিছানা থেকে উঠে এসেছিল, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবল দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদাতালার ন্যায়বাণী, তাঁর নাখোশ দিল। মজিদের ক্ৰোধ তো তাঁরই বিদ্যুৎস্ফুট, তাঁরই ক্ৰোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহীমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মতো কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিৰ্ভয়ফল দেখে আরেকটা হ্যাচক টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে উঠে বসেছিল, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে উঠবার আগেই জমিলা দেখে যে, সে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও খুব শক্তভাবে নয়। তারপর সে আপন শক্তিতে সুস্থির হয়ে দাড়াইল, এবং কাঁপিতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের

ডান হাতের কঞ্জির পানে তাকাল। হয়তো ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখল। তাতে হাত বুলাল না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেল না। কারণ আরেকটা হ্যাচক টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চললে বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে, কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিল, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও জেগে উঠেছিল জমিলার মনে। মাজারের িবসীমানায় আজ পর্যন্ত যেষেনি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিল, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসল জমিলা। মজিদের টানে শ্রোতে ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিল, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না। তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সিঁধে হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ কবে তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।

পেছনে পেছনে রহীমা আসছিল কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না; এও বুঝল না, মজিদ আমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটা কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্ৰতিপত্তিশালী লোকও বউ তালুক দেয়। দ্বিকৃতি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহীমার পানে তাকাল। তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,—হে আমার মুখে থুথু দিলো!

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল রহীমা,—কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু ক্ৰোধে খারখার করে কাঁপিতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলে মনে-প্ৰাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীক্ষ্ণতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহীমার চীৎকার শুনল কী শুনল না, কিন্তু ওধারে তাকাল না, কোনো কথাও বলল না। আরো কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাতকাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠোর মধ্যে জমিলার হাতটি টিলা হয়ে গেছে; সে-হা ও ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নেই, বন্দী হয়ে আছে বলে প্ৰতিবাদ নেই। তার হাতের লাইট মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভার দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখল। না। সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরো কঠিনতর করে তুলল। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাজকেল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে ঠাঁটতে লাগল, বাইরের দিকে। ভেবেছিল, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করবে। জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকল মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠত যে তারার ঝালকানির মতো এক

মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটা আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্বল হয়ে উঠল। এবারেও সে অসতর্ক হলো না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিলে মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি মান আলো আসে তা মাজার-ঘরের দরজাটিতেই কেবল রেখাযিত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয়, চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিক তাঁর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্ৰতায় ও দুর্বল বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠ দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা শুরু হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মতো একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখাযিত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে এসেছে এমনি সময়ে বুক ফাট কণ্ঠে মজিদ হে। হে করে উঠল। তার দুঃখের তীক্ষ্ণ তার সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়াচড় করে দুফাঁক করে দিলে। সভয়ে চমকে উঠে জমিলা তাকাল স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে। তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণমান তার অশান্ত উদভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠল। আওয়াজটা জোরাল নয়, কারণ একটা প্ৰচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আশ্রয় হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেলো। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নমা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মজিদও ক্ষিপ্ৰভাবে উঠে দাঁড়াল। জমিলা দেখল পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিশ্বাস ফেলবার যে নেই সে-ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এইটুকুন পথ পেরোবার উপায় নেই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দবাদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এই সময় সে বলে,-দেখো আমি যেই ভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুই আঙ্গুল, ভূত-প্রেতও রক্ষা পায় নাই। এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমাকে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। না হইলে মাজার পাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি অইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশেমানির ডাব জাগল না? কেনই-বা মাজার পাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগিতাছে?

এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধল। মাঝখানের

দড়িটি টিলা রাখল, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোড়া হইলে সে-ফোড়া ধারাল ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এই সব করুম না। কারণ মাজার পাকের কাছে রাতের এক প্রহর থাকলে যতই নাছোড় বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ। ডাক ছাড়ি পলাইবো। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলও না, কিছু বললেও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উচিয়ে বলল,—বাপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইকো না। দোয়াদরুদ পড়ো, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে বাপ দিয়ে চলে গেল।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহীমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—হে কই?

—মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইবো হে-জিন।

—ও ভয় পাইবো না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,—কী যে কও তুমি বিবি? মাজার পাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ঐ দুষ্ট জিনটাই পাইবো, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে। কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠল মজিদের। দম খিচে ক্বেদ সংবরণ করে সে আবার বললে,—তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহীমা ঘরে চলে গেলো। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইল তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করল না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইল। যে-কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে—এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রবায় করে তুলল। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নেই। থেকে থেকে দূরে প্যাঁচ ডেকে উঠছে, আরো দূরে কোথাও একটা দীঘ গাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চ নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়াচড়া নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমূর্ষ রোগীর পাশে শেষনিশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাস্থীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে। মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়াচড়া নেই।

আরও সময় কাটে। এক সময় মজিদ-বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগজনি শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্ফূপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র বিষ্কারবিরে শীতল হওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে-সিরসিরে শীতল হওয়া

বেশ লাগে, এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু ক'ন খাড়া হয়ে ওঠার সাথে সাথে চোখট ও তার খুলে যায়। সে দেখে না। কিছু, শোনেও লা কিছু! মেঘ দেখা। সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্ৰগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘন কালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রহীমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে।-ফিরছে। এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোনো তাগিদ। বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে অপেক্ষী যুগযুগ ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে উঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিবে দুফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে-অন্ধকারে। তবু চোখ পিটপিট করে আশায় আর আকাজক্ষায়। সে-আশা-আকাজক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাংস। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বীর বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত, প্ৰকৃতির লীলা দেখাবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না। কোরে। হয়তো-বা। সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নেই। প্ৰকৃতির লীলা চেয়ে চেয়ে দেখাও এক রকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম ক্রে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্ৰকৃতি-অবলোকনোর এবাদতই যদি কোরে থাকে মজিদ। তবে ঈশৎ বিরক্তি ধরে যেন, কারণ ভ্রর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে; দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘন কালো মেঘে, তীব্র হওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঞ্জায়, খবথর কোরে কঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ উঠে আসে ভেতবে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেবী নয়, ওধাবে মেঘের আড়ালে প্ৰভাত হয়েছে। সুবোধ সাদেক। নিৰ্ভুল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নোতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল-ফালাক। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে-কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সেঅন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্ৰভাবে মালিক। আমি বাঁচতে চাই যাত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এ-দিকে প্ৰভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোব ল বৃষ্টি। ভ্রাসংখ্য তীরের ফলার মতো সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে! তারপর “অপ্ৰত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্ৰথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদসঙ্কেত শূনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎবেগে মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দুপা এগিয়ে ওধারে

তাকিয়ে সে বলে, বিবি শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহীমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। সে কোনো উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,–বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

রহীমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ যেন জমিলার সে-দিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে–যে-দিন সাতকুল খাওয়া খ্যাংটা, বুড়ী এসে আর্তনাদ করেছিল।

এ-দিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে। পাথরের মতো খণ্ড খণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমাট বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটত, এক-আধটা হয়তে আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়ত। কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হারান হতো। বউরা আসত বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার টিল। কাবণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরার আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে।–তা দিন-রাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে মাঠে নধর কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শীষ ঝরে ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকোর যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে; যারা জানে না। তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহীমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মতো উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। এক সময়ে রহীমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,–কী হইল তোমার? দেখো না শিলাবৃষ্টি পড়ে!

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহীম, কিন্তু তবু কিছু পালে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যো-রহীম। অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটা ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, সে-ই মাঠে মাঠে কচি-নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে-রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য প্রবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না!

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,–কী হইল তোমার বিবি?

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,–ধান দিয়া কী হইবো, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ মাথা থেকে সে-মোথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটা ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখল। লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকুর মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেওয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমন কী তার মুখের একটি পেশীও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায়

শুইয়ে দিতেই রহীমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,—মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এই রকম যে, মজিদের ইচ্ছে হয় একটা হুস্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,—না। একটি থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছের ছাড়লে এই একমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহীম। তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর কী একটি। প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘনঘন হাত বুলতে শুরু করে। মায়। যেন ছলছল করে জেগে উঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুবাব হয়ে ওঠে, তার কম্পমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ। অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,—দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারো মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে,—সব তো গেলো! এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিন্দ্রি মুখটা বৃষ্টির প্ৰভাতের ম্লান আলোয় বিবৰ্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,—নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখো।

এরপর আর কারো মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তুপ। তাই দেখে চেয়ে চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।